লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

১.০ ভূমিকা

১.১ সভ্যতার সূচনালগ্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে তেমন বাদানুবাদের প্রয়োজন ছিল না। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্রীকরণ বা স্বাধীনতার দাবি বর্তমান বিশ্বে নতুনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তবে এরিষ্টটলের দর্শনে বিশেষত "দি পলিটিক্স" গ্রন্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উদ্ধৃত হয়েছিল। গ্রীক সভ্যতায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিদ্যমানতা পাওয়া যায়। এর পরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় চার খলিফার শাসনামলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার বিদ্যমানতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ক্রুসেডের নামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ঘটলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা টিকে থাকেনি। রেনেঁসা নামক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। সমগ্র ইউরোপে পার্লামেন্ট ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে। আর পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদিকে মন্টেস্কু কর্তৃক প্রচারিত হয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১.২ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কী, এবং বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু বিরাজিত আছে–এ বিষয়ে আলোচনার আগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রত্যয়ের পটভূমি সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা দরকার। মানব জাতির ইতিহাসে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সভ্যতা হলো গ্রীক সভ্যতা। গ্রীক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ বা রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তাগণ মনে করতেন যে, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, এ তিনটি বিভাগ তিন ধরনের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে। ফলে একটি সরকারের ক্ষমতাও তিন রকমের হয়ে থাকে। আর সরকারের সুষ্ঠু বা সার্থকভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারের উপর্যুক্ত কাজগুলো একেকটি বিভাগকে অন্য বিভাগ থেকে পার্থক্যশীল করে সুনির্দিষ্টভাবে পালন করার জন্য দিক নির্দেশনা গ্রীক দার্শনিকগণ প্রদান করেন।

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বহুযুগ পরে পৃথিবী পরিক্রমায় বর্তমান সভ্যতার দ্বার-প্রান্তে এসে এভাবে সরকারের তিনটি বিভাগের পার্থক্যশীলতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আর সরকারের তিনটি বিভাগের পার্থক্যশীলতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মাধ্যমে কাজ করে যাবার নীতি হলো ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি। অর্থাৎ আইন সভা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তনের কাজ করবে। এসব আইন অনুযায়ী শাসন বিভাগ কাজ করবে ও আইনসমূহ বাস্তবায়নের কাজ করবে। আর বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য করবে তথা সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়-১) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ চালনা করবে না, ২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে না ও ৩) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

১.৩ সপ্তদশ শতকে ব্যক্তি সাতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তিস্বাধীনতার মতবাদ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকলে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ Bodin ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির পুনরুজ্জীবন ঘটান। তিনি বলেন যে, অন্তত শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর হতে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। জন লক "Civil Government" গ্রন্থের মধ্যে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা করে প্রতিটি কমনওয়েলথে বিদ্যমান সরকারগুলির তিনটি ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। তবে মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত দার্শনিক মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "La Espirit des Lois" গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির পরিস্ফুটন করেন। স্বৈরাচারী চতুর্দশ লুইয়ের শাসনে যখন কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না তখনই মন্টেস্কু ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত মতবাদ প্রচার করেন।

তিনি বলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকারের তিনটা বিভাগকে পৃথক করতে হবে ও সরকারী তিনটা বিভাগের ক্ষমতা পৃথক ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে না ও একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন করে তা স্বৈরাচারীভাবে প্রয়োগ করবে। আবার আইন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পৃথক না করা হলেও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। কেননা এতে বিচারকরাই আইন প্রণেতা হয়ে দাঁড়াবে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয় সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার লেশমাত্র থাকতে পারে না।

মন্টেস্কুর ভাষায়, "যখন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও নির্বাহী ক্ষমতা একই ব্যক্তির বা কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন সেখানে কোন স্বাধীনতাই থাকতে পারে না। কারণ একই রাজা বা কর্মকর্তা স্বেচ্ছামূলকভাবে আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে ও সেগুলো স্বেচ্ছামূলক উপায়ে কার্যকর করতে পারে – এ আশংকা সেখানে দেখা দিতে পারে। আবার যদি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা বা নির্বাহী ক্ষমতা হতে পৃথক না করা হয়, তবে সেখানে স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটবে। যদি বিচার

বিভাগীয় ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নগত ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করা হয়, তবে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, কারণ তখন বিচারকরা আইন-বর্তায় পরিণত হবেন। যদি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে নির্বাহী ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করা হয় তবে বিচারকরা ভয়ংকর অত্যাচারী হয়ে পড়তে পারেন।"

জনগণের মধ্য হতেই হোক, আর ভূ-স্বামীর মধ্য হতেই হোক, একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ তিনটি ক্ষমতা-আইনবিধিবদ্ধকরণ, সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরকরণ ও ব্যক্তিগণের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসাকরণ সংক্রান্ত ক্ষমতা-চর্চা করতে যায়, তবে সেখানে সবকিছুরই অবসান ঘটবে। "অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা যা সর্বোচ্চ মানবিক কল্যাণ সাধন করবে তা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির যথার্থ প্রয়োগ আবশ্যক।"

১.৪ ব্লাকষ্টোন নামক ইংরেজ আইনজ্ঞ ও ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ আবশ্যক। তাঁর মতে, "যখনই আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎকরণের অধিকার কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিমন্ডলীর হাতে ন্যস্ত করা হয় তখনই সেখানে কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে পারে না। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই স্বৈরতান্ত্রিকভাবে আইন বিধিবদ্ধ করে তাকেই স্বৈরাচারী পন্থায় কার্যকর করতে পারেন। কারণ তিনি আবার বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষমতায় অভিসিক্ত, আইন প্রণেতা হিসেবেও তিনি নিজের জন্য যথার্থ ক্ষমতার ব্যবস্থা রাখেন।"

১.৫ ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতিটি আসলে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে সমাজে সফলভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটানোর জন্য প্রচারিত একটি মতবাদ। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ সমাজে ঘটেছে, সেসব দেশে ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির তেমন আর প্রয়োজন নেই বলে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। তবে যেসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র এখনও বিদ্যমান এবং যেসব দেশের সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিৎ, যাতে অন্তত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২.০ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থেকে কেবল আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচার-কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ বিচার কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় আদালত অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনরূপ নির্দেশ গ্রহণ করবে না এবং বিচারকগণ সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হতে মুক্ত থাকবেন। একজন বিচারক শুধুমাত্র আন্তঃব্যক্তিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন না। তিনি সরকার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগেরও বিচার করে থাকেন। এজন্য নিরাপত্তা ও ন্যায়ানুগ বিচার নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে আবশ্যিকভাবেই

সরকারের অন্যান্য বিভাগ হতে পৃথক ও স্বাধীন রাখতে হবে। সেই সাথে বিচারকদেরকে ব্যক্তিগত প্রভাব এবং সামাজিক চাপ হতে মুক্ত রাখতে হবে।

২.২ গতানুগতিক গণতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ন্যায়বিচার এবং অধিকার রক্ষার অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। এই স্বাধীনতার অর্থ হলো বিচারকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভীতি ও বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াই বিচারের কাজ সমাধা করবেন। তাছাড়া বিচারকদের উপরে রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ প্রতিহত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকা চাই। হ্যারাল্ড ল্যাস্কির মতে, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার জন্য তিনটি নীতি প্রয়োজনীয় ঃ ক) বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার সম্ভাবনা দূর করার জন্য উপযুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ খ) সদাচরণ সাপেক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের স্থায়ী নিরাপত্তা বিধান দরকার, গ) কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিৎ।

২.৩ তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোই কোন একটা দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এগুলো হলো ঃ–

ক. বিচারকদের নিয়োগঃ বিভিন্ন দেশে বিচারকদের নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে সিনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে থাকেন। ব্রিটেন–এর রাজা লর্ডসভার লর্ডগণকে মনোনীত করে থাকেন। যদিও এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যেই বিচারপতিগণ গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুতরাং বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণত তিনটি নীতি অনুসৃত হয় যথাঃ– ক) শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খ) জনগণ দ্বারা নির্বাচন, গ) আইনসভাকর্তৃক নির্বাচন।

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে কোন পদ্ধতি দ্বারা বিচারপতিদের নিয়োগ করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকতে পারে। ডঃ গার্নারের মতে, শাসন কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা বিচারপতিদের নিয়োগ হলো সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ সম্ভব হয়। কিন্তু যেহেতু মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তি এ মনোনয়ন দান করে থাকেন, সেহেতু সব ক্ষেত্রে যে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে কঠোরভাবে শুধুমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করেন তা সত্য নয়। আইন সভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এ পদ্ধতিতে বহু লোক এক বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করে বিচারকগণকে নিযুক্ত করেন। ফলে হয়তবা যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির একটা বড় ত্রুটি হলো বিচারকগণ দলাদলীর সাথে জড়িত হয়ে পড়েন নিজ পদের স্থায়ীত্বের জন্য এবং দ্রুত পদোন্নতির আশায় দলীয় স্বার্থে তারা কাজ পরিচালনা করতে পারেন। আর জনসাধারণের হাতে বিচারপতিগণের নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া মোটেও ঠিক নয়। কারণ যোগ্য ও দক্ষ বিচারক নির্বাচিত করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের খুব কমই আছে।

অন্যদিকে বলা যায় যে, মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন মানুষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক জনসমষ্টি কখনও ভুল করতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ব্যবস্থায়ই কোন না কোন দোষ বা গুণ আছে। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতিদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং শিক্ষার উপরে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নির্ভর করে। কেন্দ্রে যে পদ্ধতি পরিচালিত আছে সেই পদ্ধতির উপর যদি বিচার প্রার্থী জনসাধারণের আস্থা বা শ্রদ্ধা থাকে সে পদ্ধতিকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে গণ্য করা যায়।

খ। অপসারণ প্রক্রিয়াঃ বিচারপতিগণের অপসারণ পদ্ধতির ভিন্নতার উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ভিন্ন ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। তাই অপসারণের শর্তাবলী এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে করে বিচারকগণ সর্বদা ভীতি ও আশংকার মধ্যে থাকে। তাদেরকে সদাচরণ সাপেক্ষে পূর্ণ কার্যকাল পর্যন্ত কার্যরত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনঃ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর বাংলাদেশের বিচারপতিদের যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই অপসারণের ক্ষমতাধিকারী হন। এতে করে সন্দোহাতীতভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খর্বিত হয়। তাই বিচারকরা যাতে সর্বদা চাকরি হারাবার ভয়ে ভীত না হয়ে নিশ্চিন্তে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সে জন্য তাদের অপসারণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। যেমন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে হলে রাষ্ট্রপতি আইন সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবক্রমে তা করে থাকেন।

গ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এই যে, অবশ্যম্ভাবীভাবে বিচার বিভাগের উপর থেকে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বন্ধ করতে হবে। কারণ, যদি বিচার বিভাগের উপর আইন বিভাগ প্রভাব খাটায় তবে স্বভাবতই বিচার বিভাগ সংকীর্ণ দলাদলির ভিতর লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে এবং স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা একটি আকাশ কুসুম কল্পনায় পরিণত হতে পারে। আবার যদি বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের আধিপত্য থাকে, তবে বিচার বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে যদি কোন রায় নির্বাহী বিভাগের বিরুদ্ধে যায় তবে সেসব ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক স্বভাবতই বিচার বিভাগের রায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের আশংকা থাকে। তাই সর্বদাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার জন্য বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। তবে সে সাথে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের জন্য অবশ্যম্ভাবী ভাবেই শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। কারণ, শাসন বিভাগই বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকরী করার বৈধ কর্তৃপক্ষ। তাই উভয়ের মধ্যে কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ বিহীন সহযোগিতাও অপরিহার্য।

ঘ। বিচারকদের সততাঃ বিচারকদের সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। বিচারকদের যোগ্যতা আইন সভার বা শাসন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিচারকদেরকে আইন সম্বন্ধে সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং

অবশ্যই রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে হবে। তাদেরকে সদা পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চলবে না। বিচারকরা যদি তাদের সততা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি বজায় রাখতে না পারেন তবে বিচার বিভাগের কী নিরপেক্ষতা, কী স্বাধীনতা, কী প্রাধান্য, কোনটিই রক্ষিত হবে না। কারণ বিচারকরা যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান না হন, তবে তাদের কারণেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

ঙ। বেতনের পরিমাণ ঃ উপযুক্ত যোগ্যতা সংবলিত ব্যক্তিগণকে বিচার কার্যে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতনের পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেতনের পরিমাণ যদি পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমান সম্পন্ন জীবন যাপনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। বেতনের পরিমাণ উপযুক্ত করে তাদেরকে সব ধরণের প্রলোভনের উর্ধ্বে রাখতে হবে, যাতে তারা অর্থের কারণে সততা পরিত্যাগ না করেন। তাদের কার্যকালের মধ্যে বেতনের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত নয়।

চ। সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ সাংবিধানিক প্রাধান্য কোন দেশের স্বাধীনতা ও নিপেক্ষতা রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংবিধানিক প্রাধান্য বলতে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সমুদয় কর্ম পরিচালনার কার্যক্রমকে বুঝানো হয়ে থাকে। সংবিধানের মধ্যেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবৃত থাকে। তাই সংবিধানের প্রাধান্য যদি বজায় থাকে তবে তার অর্থ হবে সংবিধান অনুযায়ী কোন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্নভাবে বজায় থাকবে।

২.৪ সর্বপোরি বিচারপতিদেরকে তাদের অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একদিকে যেমন যোগ্য হতে হবে, তেমনি মানসিকভাবে তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা অবসর নেয়ার পরে আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে না পারেন। সেই সাথে তারা যেন আর্থিক সংকটে পতিত না হন সেজন্য চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরে সকল বিচারকের পারিতোষিক হিসেবে পর্যাপ্ত পেনশনের বিধান রাখতে হবে। তবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিচারপতিদের মানসিকতা বিচার করা জরুরি, সমাজের সদস্য হিসেবে বিচারপতিরা সমাজে বিদ্যমান কোন না কোন মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকেন। সামাজিক অবস্থানের দ্বারা সামাজিক চেতনার মান ও স্তর নির্ধারিত হয়। এবং সে কারণেই বিচারপতিদের সামাজিক অবস্থান তাদের চেতনা, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই নিজস্ব মূল্যবোধকে বর্জন করে অঙ্গিকারবিহীন অবস্থায় আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রডি, অ্যান্ডারসন এবং ক্রীষ্টাল যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "Even where the greatest care is taken democreacis to secure the services of high minded impertial judges, the human element creeps inevitably in the judicial process judges however, distinguise

are still men not Gods sitting upon olympus and judging the controversies of mere mortals with complete detachment"

বিচারপতিদের পারিবারিক ও শিক্ষাগত পটভূমি, অভিজ্ঞতা এবং দর্শনের দ্বারা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। বিচার বিভাগের পদ্ধতি সর্বদা যুক্তিবাদী, আইনানুগ যান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয় না। ব্যক্তিগত উপাদান (common sense) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বিচারকেরা তাদের পূর্বসুরীদের সিদ্ধান্তের ধারাকে অনেক সময় অনুসরণ করেন না। পরিবর্তিত অবস্থা এবং নুতন বিচারকের নিয়োগ আইনের নুতন নিয়ম সৃষ্টি করে। বিচার বিভাগের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিচারকেরা প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পরে তার বিন্যাস অতীতের নজীরের মাধ্যমে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। বিচারপতিরা কেবল আইনগত যুক্তি এবং নজিরের দ্বারা পরিচালিত হননা, তাদের আর্থিক, সামাজিক মতাদর্শগত পটভূমি ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবার্ট ডাল এর মতে বিচারকেরা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হবার পূর্বে নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত থাকেন এবং দেশের বৃহৎ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিজেদের অঙ্গিকার ঘোষণা করেন। বিচারপতি ফ্রাঙ্কফার্টার ও উল্লেখ করেছিলেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট জনপ্রতিনিধিদের মতামত, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মতামতের সঙ্গে–নিজেকে জড়িয়ে সংবিধানের এবং আইন গ্রন্থের প্রাণহীন পৃষ্ঠায় জীবন সঞ্চারণ করেন। সাধারণভাবে আদালতের পক্ষে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ জাতীয় সমস্যার বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে আদালতের সামনে যখন বিভিন্ন বিকল্প উপস্থিত হয়, তখন আদালতের পক্ষে মূল্যায়নমূলক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। জ্যাক পেলটাসনের ধারণানুসারে, একথা সত্য যে, আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারকেরা তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিদ্যমান মতাদর্শের দাবি অনুযায়ী পছন্দ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের সমর্থন নিয়ে সমাজে কোন বিরোধ দেখা যায় না এবং এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত সহজ। যেখানে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে ব্যাপক মতৈক্য বর্তমান, সেখানে বিচারকদের কাজ সহজসাধ্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিচারপতির সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু গুরুতর মতভেদ থাকলে বিচারপতির পছন্দের প্রশ্ন ওঠে এবং এখানে আইন বিচারপতির নিজস্ব সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। তাঁর মতে, আইনসভার সদস্যদের মত বিচারকেরাও গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে লিপ্ত। কিন্তু তাঁদের অংশগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য বর্তমান।

২.৫ রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জি এম কার্টার এবং জে এইচ হার্জের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সমভাবে ন্যায় বিচার প্রয়োগের অসুবিধা অনেক। মোটের উপর, আইনের চোখে সমতার আদর্শকে মানুষই প্রতিষ্ঠা করবে। নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার মনোভাব যত প্রবলই হোক না কেন, মানুষ চূড়ান্তভাবে আদর্শের প্রাধিকারের দ্বারা লালিত এবং এমনকি পূর্ব–পরিকল্পিত ধারণা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার দ্বারা পরিচালিত সমাজের কোন নির্দিষ্ট স্তর বা শ্রেণীর হতে বিচারপতি নিয়োগ করা হলে কোন বর্ণভূক্ত

লোক বা শ্রেণীর দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে গ্রাহাম ওয়ালেসের রচিত "Our social heritage গ্রন্থে বিধৃত মতামত প্রনিধানযোগ্যঃ "We make a judge independent not in order to spare him personal humiliation but in order that certain motives shall not and certain other motives shall direct his official conduct."

২.৬ তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে মোটামুটি ভাবে ক্রিয়াশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। বিশ্ব বিখ্যাত "মারবারি" বনাম "ম্যাডিসন" মামলায় বিচারপতি মার্শাল আদালতের বিচার অনুযায়ী সংবিধান বিরোধী আইনকে অবৈধ ঘোষণার ক্ষমতা ১৮০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন। যথাযথ আইনগত পদ্ধতি অনুসারে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ব্যাপক। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৭ অনেক সময়ই সংবিধানের অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুলিখিত সংবিধান থাকা সত্বেও আইনের সাংবিধানিকতা বিচারপতিদের ব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধলে সে বিরোধের মিমাংসা মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট করে থাকে। ১৮২১ সালে প্রদত্ত মেরিল্যান্ড মামলায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ রায়টি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পরিবর্ধন করেছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণগত বৈষম্য দূরীকরণ, ষ্টেট আইন পরিষদ ও প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচনী এলাকায় অসম বিভক্তি দূরীকরণ, নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে কর্তব্য পালন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.৮ গ্রেট বৃটেনে আদালত পার্লামেন্টের কোন আইনকে সংবিধান বিরোধী আইন বলে বাতিল করে দিতে পারে না। বৃটেনের বিচার বিভাগকে স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে সার্বভৌম এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অস্তিত্বের ফলে বিচার বিভাগকে আইন প্রণেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা করতে হয়। তবে বৃটেনের বিচার বিভাগ সব ধরনের প্রভাব ও অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার উৎকৃষ্ট নজির স্থাপন করতে পেরেছে।

২.৯ সুইজারল্যান্ডের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে ফেডারেল ট্রাইব্যুনাল কেন্টেনের আইনকে ব্যাখ্যা করে সুইজারল্যান্ড সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য অংশটুকুকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করার নজির স্থাপন করেছে। তবে এই ফেডারেল ট্রাইব্যুনাল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং ফেডারেল আইনের সাংবিধানিকতা পর্যালোচনার অধিকার সংরক্ষণ করে না। জার্মানীর আদালতকে আইনের সাংবিধানিকতা পর্যালোচনা করার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জার্মানীর আদালত নাগরিক অধিকারসমুহ সুরক্ষার জন্য প্রধান কর্তা হিসেবে যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার সুপ্রীম কোর্ট যেকোন আইনকে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা তা বিচারের ক্ষমতা রাখে। ইটালীর সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপভাবে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষমতা সংরক্ষণ করার এখতিয়ার আছে।

২.১০ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতের বিচার বিভাগও যথেষ্ট স্বাধীন ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। যদিও ভারতবর্ষের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করত। তবুও সংবিধানের চব্বিশ, পচিশ এবং ছাব্বিশতম সংশোধনের ফলে সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে বর্তমানে কেন্দ্র–রাজ্য বিরোধ মিমাংশার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিস্তর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ভারত বর্ষের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালত নাগরিকের উপর বাধা নিষেধের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে। হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এমনকি ভারতীয় সংবিধানের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে শাসন বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করে বা ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৩.০ বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো এজন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যাতে করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার দায়িত্ব আদালতের উপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিচারকগণ বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। বিচারকদের এই স্বাধীনতা কার্যকর করার জন্য এর পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আরো কতিপয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবিধানে বিবৃত হয়েছে।

৩.২ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি সুপ্রীম কোর্ট, অন্যান্য অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। বিচার বিভাগের শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীমকোর্ট আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত – ১) হাইকোর্ট বিভাগ এবং ২) আপীল বিভাগ। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট পৃথক সংস্থা না হলেও প্রকৃত পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সাধারণ ক্ষমতাগুলি আপীল বিভাগই প্রয়োগ করে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের নিচে আছে জেলা জজের আদালত এবং তার নিচে আছে সহকারী জজের আদালত। জেলা জজ আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপরে হাইকোর্ট বিভাগের তত্বাবধানের/নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে।

৩.৩ বাংলাদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগ শুনানী গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে। তবে আপীল বিভাগের কোন আদি এখতিয়ার নাই। হাইকোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ার এবং আপীলের এখতিয়ার আছে। সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ানী মামলায় জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল গ্রহণ করে। অন্যদিকে দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী মামলার আপীলও এই আদালত শ্রবণ করে। দেওয়ানী মামলাগুলো বিচারের জন্য নিম্ন পর্যায়ে সহকারী জজ (মুন্সেফ) এর আদালত রয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্য স্তরের ফৌজদারী মামলার বিচার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপরে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত–প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদালতের উপরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালত আছে। আর মৃত্যু–দন্ড বা যাবজ্জীবন সাজা প্রদানযোগ্য বা গুরুতর শাস্তিযোগ্য ফৌজদারী মামলাগুলো বিচার করেন দায়রা জজ, যিনি কিনা জেলা জজ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশে দেওয়ানী ও উচ্চস্তরের ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সম্পূর্ণভাবে পৃথক কোন আদালত নাই। একই আদালত বা বিচারক জেলা জজ ও দায়রা জজ হিসেবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–এদেশের নিম্নস্তরের বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের সাথে একীভূতভাবে ক্রিয়াশীল।

৩.৫ এদেশের উচ্চ স্তরের আদালতগুলোর বিচারকগণ (হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের) বিচার বিভাগীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন এবং তাঁরা শাসন বিভাগ হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথকভাবে কাজ করেন। কিন্তু এদেশের নিম্ন স্তরের আদালতগুলো অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণ শাসন বিভাগের কর্মকর্তা এবং তাঁরা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করেন। আবার জেলা জজ ও দায়রা জজ, সাব–জজ এবং সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত বিচারকগণ আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হন। এভাবে তাঁরাও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত, পদায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না। অথচ সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে–বলা আছে যে, বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ভার সুপ্রীম কোর্টের উপরে ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরে অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের জন্মের পরে ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ আজও সম্ভব হয়নি।

৩.৬ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা

করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রীট গ্রহণ এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগকে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য সংবিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী এদেশের বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলী সম্বন্ধীয় যে বিধান রাখা হয়েচে তা নিম্নে আলোচনা করে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস চালানো হলো:

৩.৭ নিয়োগ পদ্ধতি ঃ– বিচারকদের নিয়োগ–পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। ভারত, বৃটেন প্রভৃতি দেশের মতো আমাদের দেশের বিচারকদের নিয়োগের ক্ষমতা শাসন বিভাগের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে তিনি অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগদান করেন সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য নন। অন্যান্য সমুদয় কর্মকান্ডে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য থাকায় এক্ষেত্রে শাসন বিভাগীয় প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। তবে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। কারণ সংবিধানে বিচারকদের যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর এই নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতেই বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

৩.৮ চাকরির নিরাপত্তাঃ– বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রাধান্য তথা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে উপযুক্ত বিধান রাখা হয়েছে। শাসন বিভাগ বিচারকদের নিয়োগ দান করে ঠিকই, কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারে না। অসদাচরণ বা অসামর্থের বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ বাষট্টি বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন। ভারত, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই আমাদের দেশেও আইন সভার প্রস্তাব ব্যতীত শাসন বিভাগ বিচারকদের অপসারণ করতে পারবে না।

৪.০ বেতন-ভাতাদি প্রদানে বিশেষ প্রাধিকার

৪.১ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের উপরে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যয় সম্পর্কে সংসদের বাৎসরিক মঞ্জুরীর প্রয়োজন হয় না। কোন বিচারকের নিয়োগের পরে তাঁর বেতন–ভাতা ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যায় না যা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। এদেশের বিচারকদের বেতনের পরিমাণ সংসদের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতের মতো বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারকদের বেতনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বিচারকগণ যাতে সমস্ত রকমের প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে কাজ করতে পারেন সেজন্য কোন বিচারক অবসর নেয়ার

পরে কোন আদালতে ওকালতি করতে পারবেন না এবং সরকারী কোন কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে যখন অবসর গ্রহণের পর কোন সরকারী পদ লাভের আশা থাকে না তখন বিচারকগণ সরকারকে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা না করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সমাধা করতে পারেন।

৪.২ বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ কিছু ফলপ্রসূ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রীম কোর্ট যে কোন ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করতে পারে। বাংলাদেশের সকল কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা করতে বাধ্য। সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনভাবে আদালতসমূহের কর্ম পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন ও নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্ট আদালত অবমাননার জন্য তদন্ত ও শাস্তি প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বন্টনের মাধ্যমে বিচারকদের কর্মকান্ড প্রভাবিত করা যায় না।

৪.৩ মাঝে মাঝে অবশ্য এদেশে সরকারী তরফ থেকে শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোন কোন সময় রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবী উঠেছে, কখনও বা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের স্বার্থ বিরোধী হতে পারে এরূপ আশংকায় বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়নি। এদেশে সর্বপ্রথম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল চতুর্থ জাতীয় সংসদে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য বিল উত্থাপনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থহানি ঘটতে পারে এরূপ আশংকা থেকে শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি।'৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পরে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের সাংবিধানিক নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে পঞ্চম জাতীয় সংসদে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এ বিলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কাঠামোর মধ্যে আনার প্রস্তাব করা হয় এজন্য বিচার কার্যে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা অর্থাৎ সহকারী জজ থেকে শুরু করে সকল স্তরের বিচারকের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, বিচার কার্যে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে তাদেরকে হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের যে সকল কর্মকর্তা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করবেন তাদেরকে হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে প্রেষণে পদায়ন করে তাদের দ্বারা পূর্ণকালীন ফৌজদারী বিচার কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়। আর তারা জেলা প্রশাসকের অধীনে নয় বরং জেলা জজের অধীনে থেকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

অন্যদিকে প্রশাসন কার্যে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে "প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট" হিসাবে উক্ত বিলে উল্লেখ করা হয় এবং তাদের হাতে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণ এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ যেসব কর্মকান্ড প্রশাসনিকভাবে নির্বাহ করে থাকেন সে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার আইনগত বিধান এই বিলে রাখা হয়েছিল।

৪.৪ এই বিলটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের আগে বিলটি ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠির মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার জন্য সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা অনুযায়ী সংসদের বৈঠকে নিয়মিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

৪.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সবক'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বেশ জোরে শোরে উচ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ এটা জনদাবীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সংসদের ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরনের জন্য সাংবিধানিক দাবী বাস্তবায়নের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। আশার কথা হলো-বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণের পরপরই জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমরা আশা করতে পারি যে, অবিলম্বেই এদেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৫.০ উপসংহার

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে কতটুকু বিদ্যমান তার দ্বারা কোন সমাজের অগ্রগতির মাত্রা বা উন্নয়নের ধাপ পরিমাপ করা যায় বলেই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ণ সাধনের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ বলে বর্তমান বিশ্বের সবক'টি উন্নত দেশেই ধারণা করা হয়। আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না বা সাংবিধানিক বিধিবিধান কার্যকরী করলেই চলবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দরকার হলো সেই সমাজের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ স্বয়ং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষাকারী বিধি বিধান ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে

সফলভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম শর্ত হলো সমাজে আইন শৃঙ্খলার যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। বর্তমান বিশ্বে এ ধারণা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যাপক জনগোষ্ঠী যদি আইন শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তবে সেই সমাজে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের সদস্যরা যদি নির্বিঘ্নে ও সব রকমের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সর্বোপরি দূর্নীতি মুক্ত থেকে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কোন সমাজে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে, তখনই সেই সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। এজন্যই আমাদের সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সাথে সাথে সমাজের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম প্রচলিত আইন ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত (Regulated) করার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার প্রতি সমাজের জনগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ৩০শে জুন, ১৯৯৪।

২। এরিস্টটল (মূল), অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম, *দি পলিটিক্স* ঃ ঢাকা।

৩। Griffith, Ernest S- *The Amirican System of Government*, Published by Methuenn & Co. Ltd, London, 1965.

৪। আর এম, ম্যাক আইভার, *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দীন আহম্মদ অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৩।

৫। শ্রী নির্মল কান্তিঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা;* রবীন্দ্র লাইব্রেরী কলকাতা-১২, সেপ্টেম্বর-১৯৭৫।

৬। সুপ্রীম কোর্ট *বিচারপতিদের (কর্মের শর্তাবলী) আদেশ*, ১৯৭৩, (Po. No. 21, 1973) বি, জি, প্রেস, ঢাকা।

৭। Almond GA. & Coleman J. S, *the Politics of Developing Areas.*

৮। Finer, H. *The Theory and Practice of Modern Government.*

৯। হক, আবুল ফজল; *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-অক্টোবর-১৯৭৪।

১০। দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে জুন-১৯৯৬ সংখ্যা।

১১। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে জুন, ১৯৯৬ সংখ্যা

১২। The Independent, June 20, 1996.

১৩। Laski, H, J. - A Grammer of Politics. London.